International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-VI, May 2015, Page No. 6-12
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

রমা ও পারমিতা – বাংলা চলচ্চিত্রে স্বতন্ত্র নারী ভাবনা

সর্বশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়, পশ্চিম বাংলা, ভারতবর্ষ
এবং বর্তমানে গবেষণারত, ডিপার্টমেন্ট অফসাউথ এণ্ড সাউথ ইষ্ট এশিয়ান স্টাডিজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

The present paper aims to establish he need for reading film in the context of social science with its multi-dimensional approach. Hence it likes to observe how far the concept of 'Individual Woman' has been portrayed in the two films – Mrinal Sen's Pratinidhi (1964) and Aparna Sen's Paramitar Ekdin(1999).These two films were basically concerned with women's problems and its transcendence. While Pratinidhi dealt with widow marriage , motherhood and death, Paromitar Ek Din was engaged in motherhood, women's relationship, divorce and in search for a new life. The films mentioned were made with almost three decades flowing between them. While Rama (the protagonist of Pratinidhi), surrenders herself to oblivion and death, Paromita(protagonist of Paromitar Ek din), curves out her own path. The paper studies the psycho geography of the women from two different decades. It also tries to understand the phenomenon that existed in the '60s and which matured in the late '90s, that gave women the essential identity to be called as individuals- of course who lived, and not perished like Rama.

Key Words: Film, Individual, Woman, Patriarchy, Widow Marriage, Divorce, Motherhood.

সাম্প্রতিক সময়ে সমাজ বিজ্ঞান গবেষণায় গণমাধ্যমের অন্যতম উপাদান হিসেবে তথ্যচিত্র এবং চলচ্চিত্রের গুরুত্ব বিষেশভাবে স্বীকৃত।[১] বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব থেকেই ভারতবর্ষে চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু গবেষণার বিষয়রূপে ভারতবর্ষে চলচ্চিত্রের স্বীকৃতি পেতে অনেকটা সময়ের দরকার হয়ে পড়ে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তথ্যসংরক্ষণের প্রয়োজনে সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে তথ্যচিত্র নির্মাণ করা হত এবং ঔপনিবেশিক শাসন ও স্বাধীনতা (১৯৪৭) পরবর্তী সময়ে একদিকে যেমন বাস্তব ঘটনা ক্যামেরা বন্দী করা হত তেমনই তার পাশাপাশি রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়কে ভিত্তি করে চলচ্চিত্র নির্মাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশ্য যেকোন নির্দিষ্ট চলচ্চিত্রের তার শিল্পরূপ অনুসারে শ্রেণীগত পরিচয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[২] অধিকন্তু নারীর ইতিহাস চর্চায় নারী চরিত্র প্রধান অথবা নারী-বিষয় কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রগুলি অপর একটি শ্রেণীরূপে বিবেচ্য হয়ে থাকে।[৩] তথ্যচিত্রের সাথে চলচ্চিত্রের প্রধান পার্থক্য হল এই যে চলচ্চিত্র সমূহের এমন কোন দায় নেই যে সেগুলিকে কেবলমাত্র তথ্য-নির্ভর করেই নির্মাণ করতে হবে – এমনকি চলচ্চিত্র সমূহ কোনভাবেই তথ্যনির্ভর নাও হতে পারে। বর্তমান গবেষণা পত্রটিতে তিনটি বিষয়কে সংযুক্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা হবে এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রে 'স্বতন্ত্র নারী' উন্মেষের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, যেকোন ব্যক্তি-ই অপরের তুলনায় স্বতন্ত্র হলেও কোন ব্যক্তি যখন সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থায় নিজের আইনত অধিকার বাস্তবায়িত করার জন্য সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপরীতে সক্রিয় হন তখন সমসাময়িক সমাজে তার স্বতন্ত্র পরিচিতি ঘটে। আবার কখনও বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার নিজস্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সামাজিক স্রোতের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন এবং নৃতত্ত্ববিদ Louis Dumont মনে করেন যে যেকোন সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণভাবে যেমন প্রতিটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির অবস্থান পাওয়া যায়, তেমনই উপরোক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যক্তিরা সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র ব্যক্তি।[৪] বর্তমান আলোচনায় যে বিষয়গুলিকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করা হবে সেগুলি হল—প্রথমতঃ গবেষণা পত্রের মৌলিক উপাদান হিসেবে দুইটি বাংলা চলচ্চিত্র এবং গৌণ উপাদানরূপে আলোচ্য দুইটি চলচ্চিত্রের বিষয় নির্ভর যেকোন প্রকাশিত তথ্যের অন্তর্ভূক্তি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ চলচ্চিত্র মৌলিক উপাদানরূপে বিবেচিত হলেও বিষয়গত প্রশ্নে আলোচ্য চলচ্চিত্র দুটি – মৃণাল সেন পরিচালিত 'প্রতিনিধি' (১৯৬৪) এবং অপর্ণা সেন পরিচালিত 'পারমিতার একদিন' (১৯৯৯), ভারত তথা বাঙালির সামাজিক ইতিহাসের ধারার সাথে সংযুক্ত হয়ে সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে পুষ্ট করেছে। তৃতীয়তঃ উক্ত দুইটি চলচ্চিত্রেই বিষয় হিসেবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর বৈষম্যমূলক অবস্থানজনিত পরিণতি এবং প্রতিবাদের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে এবং চলচ্চিত্রগুলি নারী চরিত্রপ্রধান ফলে স্বাভাবিকভাবেই তা মানবী বিদ্যা চর্চার সাথে যুক্ত। উপরোক্ত তিনটি বিষয়কে সংযুক্ত করেই চলচ্চিত্রে স্বতন্ত্র নারীর উন্মেষের বিষয়টি সমগ্র গবেষণাপত্রে আলোচিত হয়েছে।

মৃণাল সেন পরিচালিত বাংলা চলচ্চিত্র 'প্রতিনিধি (The Representative, মুক্তি পায় ১৯৬৪ সালে)-র সূত্রটি হল অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের লেখা উপন্যাস 'প্রচ্ছদপট' (The Cover)। গল্পটি ত্রিকোণ সম্পর্কের। রমা (অভিনয়ে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়) যখন বিধবা হয় তখন তাঁর ছেলে টুটুল'র বয়স পাঁচ বছর। রমা নিরেন'র প্রেমে পড়ে এবং উভয়ে বিয়ে করে। এই চলচ্চিত্রে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে ১৯৬০'র দশকের একটা সামাজিক প্রতিছবি আমরা দেখতে পাই। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও বিধবা নারী-র জীবনে প্রেম - তাও আবার যিনি সন্তানের মা সেক্ষেত্রে এই সম্পর্ক পিতৃতান্ত্রিক সমাজ শুধু যে অনুমোদন করেনা তাই নয় সংশ্লিষ্ট নারী-র চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তোলে কারণ তা নারীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও স্বাধীনতা অনুসারী। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে ঐরূপ বিপরীত অবস্থার মধ্যেও সন্তান সহ বিধবা মহিলাটি নিজের প্রয়োজন ও ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়ে যখন দ্বিতীয়বার বিবাহের সিদ্ধান্ত নেন তখন সমকালীন ভাবনার বিচারে তিনি আর পাঁচজন নারীর তুলনায় স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন, কারণ এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট নারীর সাহসের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শেষপর্যন্ত রমা তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারেনি, সে পিতৃতান্ত্রিক পরম্পরার সংস্কারের কাছে পরাজিত হয়েছে। রমার এই পরাজয় তাকে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যার পথে প্ররোচিত করেছে, নিজের অর্ন্তদ্বন্দ্ব থেকে সে উত্তরিত হতে পারেনি, বরং স্বতন্ত্র নারী হয়ে ওঠার মূল্য দিতে গিয়ে আর একভাবে সে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৮৫৬ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্ঠায় বিধবা বিবাহ আইন সঙ্গত হলেও তার শতবর্ষ পরেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, তার কারণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে সামাজিক পরিকাঠামোয় নারীর অবস্থান চিহ্নিত হয়ে এসেছিল, নবজাগরণ বা আইনসিদ্ধ সংস্কার তা সহজে পরিবর্তন করতে পারতো না। নারীর শিক্ষার অভাব ও চলে আসা সংস্কারের প্রভাব সাধারণত তার পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বোধকে নিয়ন্ত্রিণ করত, ফলে বিধবা বিবাহের পরও রমা'র মানসিক দ্বন্দ্ব আমরা লক্ষ্য করি, কারণ রমা'র বিয়ের পরে তার পুত্র টুটুল নিরেনকে বাবা হিসেবে মেনে নিতে পারে না। নিরেন চেষ্টা করে টুটুলকে বোঝাতে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। এই অবস্থায় রমা এক অস্বস্তিতে পড়ে, কিন্তু কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারে না। চলচ্চিত্র বিশ্লেষক Jhon W. Hood, রমার এই মানসিক যন্ত্রণার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'The woman's more than careful attention to the boy reflects her sense of betrayal of her late husband.'[৫] উপরোক্ত বক্তব্যের নিরিখে কতগুলি ভাবনা উঠে আসে – প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় কোন সামাজিক পরিকাঠামোয় রমা'র এই অপরাধবোধ? রমার বৈধব্যের জন্য রমা দায়ী নয়, উপরন্তু মৃত স্বামীর প্রতি রমার বিশ্বাস রাখা বা না রাখার (যদি তা পুনর্বিবাহকেই নির্দেশ করে) প্রশ্নটি বাস্তব বিষয় নির্ভর, একই বাস্তবের সম্মুখীন যদি রমার প্রথম স্বামীকে হতে হত তাহলে আবশ্যিকভাবে তার স্বামীকে পুত্র মানুষ করার জন্য দ্বিতীয়বার বিবাহের উপদেশ দেওয়ার লোকজনের অভাব হত না, কারণ সেটাই ছিল যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক পরিকাঠামো, যা পুরুষকে দুঃখজনক বাস্তবের সামনে অসহায় করে না, বরং সমস্যার চরিত্র অনুসারে তাকে নতুন করে বাঁচতে সাহায্য করে। দাম্পত্য সম্পর্কে বিশ্বাস রাখার প্রশ্ন দুজনেরই, কারণ সম্পর্ক শুরুই হয় পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস দিয়ে। কিন্তু চলার পথে যদি একজন চিরতরে হারিয়ে যায় আর তখন যদি অপরজন আর্থ-সামাজিক কারণে নিঃসঙ্গ অসহায় হয়ে পড়ে এবং তার বাস্তব পরিস্থিতিতে যদি পুনরায় বিবাহ করার প্রয়োজন হয় অথবা তার নিজের-ই ইচ্ছা হয় দ্বিতীয়বার বিবাহ করার এবং তা সম্ভব হয় তাহলে এ বিষয়ে তো অন্য কারও অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। এই যে সামাজিক নির্দেশ (দেশ-কালের প্রেক্ষিতে এই নির্মাণের চরিত্র ভিন্ন-রূপ পায়) তা পুরুষকে নিজ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ছাড়পত্র দেয়। প্রসঙ্গত উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর বেশ কিছুটা সময় জুড়েই দেখা যায় যে ভারতবর্ষসহ সারা বাংলায় পুরুষের একাধিক বিবাহ (কুলীন ব্রাহ্মণ/বিপত্নীক/ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ইত্যাদি) যথেষ্ট স্বাভাবিকভাবেই সমাজে গ্রহণযোগ্য ছিল।

শিশু বয়স থেকেই বালিকাটির মনে ধীরে ধীরে পুরুষের তৈরী করে দেওয়া সামাজিক পরিকাঠামো অবচেতনভাবে কাজ করতে শুরু করে, প্রোথিত হয় সারাজীবনের নৈতিকতার ভিত্তি এবং একটা সময়ে সেই বালিকাটিও ঐ পুরুষপ্রধান সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যায়, কারণ এভাবেই সামাজিক নির্মাণ হয়ে থাকে, আর এই নির্মাণের পরম্পরা চলে আসে এজন্যই যেহেতু তা আপাতভাবে নারীকে মৌলিক নিরাপত্তা (অন্ন, বস্ত্র এবং আশ্রয়) দিয়ে এসেছে। বাস্তব সমাজ জীবনে, সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে (শ্বেতপাথরের থালা) দেখা যায় প্রতিষ্ঠিত সমাজের মহিলারা কি অদ্ভুতভাবে আর একজন মহিলাকে সমালোচনা করেন, যিনি স্বামী পরিত্যক্তা বা স্বামীহারা হয়েছেন। বিষয়টা অনেক সময় এমনও হয় যেন ঐ অবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট মহিলাই দায়ী। কিন্তু যে লোকটির উপর নির্ভর করে শিশু বয়স থেকেই অলীক নিরাপত্তার কথা ভাবা হয় এবং বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে নিশ্চিত করা হয়, সেই নিশ্চয়তা যে কোন মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে একদা নিরপত্তা প্রদানকারী সমাজের কি কোন দায়িত্ব থাকতে পারে না? সমাজ যে এসব নিয়ে বিশেষ ভাবতো না তা অজানা নয়। নারীকে সাবলম্বনের শিক্ষা সমাজ দেয় না তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও তাকে যথেষ্ট অসম্মান আর অবহেলা নিয়ে শ্বশুরবাড়ী বা পিত্রালয়ে থাকতে হয়। 'প্রতিনিধি' চলচ্চিত্রে শেষ পর্যন্ত রমা আত্মহত্যা করে। রমা কেন আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিল তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে মনস্তাত্তিক বিশ্লেষণে। Sigmund Freud হলেন এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর মতে আমাদের বিভিন্ন কাজের পশ্চাতে বিভিন্ন উদ্দেশ্যগুলি অবচেতন স্তরেই গড়ে ওঠে। তিনি আমাদের মনকে তিনটি স্তরে বিশ্লেষণ করেছেন – মনের সচেতন স্তর যার মধ্যে বর্তমান সচেতনতা পড়ে, দ্বিতীয় স্তর – প্রাক সচেতন স্তর-যার মধ্যে অবচেতন অবস্থা থাকলেও যা স্মরণযোগ্য, এবং অসচেতন স্তর যেখানে বিভিন্ন ধারণাগুলি জোর করে চেপে রাখা হয়েছে, যা স্বপ্নে বা স্লিপ অফ দি টাং হলে প্রকাশ পায়। শুধু তাই নয় ফ্রয়েড বিশ্বাস করেন যে তিনটি প্রধান বিষয় মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, এগুলি হল যথাক্রমে ইদ (id) – যা প্রধানত প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মনের অযৌক্তিক এবং অসচেতন স্তর, এরপর ইগো (ego), এই স্তরে সচেতন ও যুক্তিবাদী মন ইদ-কে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, এবং সুপার ইগো (superego), যাকে ইগো-র ই একটা অংশ বলে মনে করা হয়, যা

বিচারক বা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেয়। কিন্তু তবুও ফ্রয়েড-র ভাবনা অনুসারে বলা যায় যে '… the unconscious is eternal – it will always exist – but that does not mean that it transcends history. The unconscious plays a crucial role in the way we internalize the laws and beliefs of our society. Although these laws and beliefs are themselves subject to cultural change, they have historically laid the foundations of patriarchy.'[৬] সুতরাং রমার দ্বিতীয়বার বিবাহের সিদ্ধান্ত তার বাস্তব সচেতন চিন্তা থেকে উঠে এলেও অবচেতনে কাজ করতো যুগ যুগ ধরে চলে আসা কুসংস্কার, যা তাকে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। এই চলচ্চিত্রে কোন নায়ক বা খলনায়ক নেই। নিরেন উদার ও অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ, রমা যথেষ্ট মধুর স্বভাবের এবং কর্তব্যপরায়ণ স্ত্রী, টুটুলও আকর্ষণীয় শিশু। কিন্তু আপাত স্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার কারণ ছিল মনস্তাত্ত্বিক, যাকে চলচিত্র সমালোচক দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় কুসংস্কার বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন, 'But among the trio, the chemistry never works and it becomes a triangle with the three sides moving in three different directions. this was due to the deep-rooted prejudice prevalent in the middle-class mind.'[৭] তাহলে যুগ যুগ ধরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের যে সাংস্কৃতিক নির্মাণ-তার-ই তো শিকার 'রমা' এবং রমা-রা। যদিও বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বিধবা বিবাহ উনবিংশ শতাব্দীতে আইন সম্মত স্বীকৃতি পেয়েছিল (১৮৫৬), 'Yet, as far as the middle class is concerned, it remained in the textbooks of law as an alien concept.'[৮] বলেছেন দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়। সমগ্র চলচ্চিত্র জুড়েই রমা তাঁর প্রথম স্বামী ও তাঁর প্রতিনিধির জন্য মানসিক যন্ত্রণা ও অপরাধবোধে ভোগেন, নিরেন উদার এবং সাহসী হলেও টুটুল ও রমার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে তার অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিরেনের এই অসহিষ্ণুতার গভীরেও একই কুসংস্কার। শ্রী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'The impatience and uneasiness spring from the same prejudices which he is not strong enough to overcome.'[৯]

মৃণাল সেন চলচ্চিত্রটি খুব সাধারণ সিদ্ধান্ত দিয়ে শেষ করেন, রমা'র আত্মহত্যা-ই যেন দর্শকের অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য চলচ্চিত্র সমালোচক এখানে থেমে যান-নি, Jhon W. Hood তাই পরবর্তী সময়ে বলেছেন, 'Her final act of desperation could be seen by the tradition bound as a righteous act of expiation which gives to the film an acceptable conclusion. However, while Sen's sympathetic handling of human sensibilities and frailties might make impossible his support for the traditionalist, the film, in fact, is given no obvious ideological conclusion. As with so much of his more mature work, the audience is left to grapple with controversy; in this case, the question: can a mother be someone else's wife?'[১০] সত্যিই এই চলচ্চিত্রে এটা-ই তো মূল প্রশ্ন যে একজন মা-কি অপর কোন পুরুষের স্ত্রী হতে পারে? এ বিষয়ে আমরা প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের কথা ভেবে দেখতে পারি এবং তাহলে বোঝা যাবে যে কিভাবে ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। ভগবত গীতা অনুসারে, 'It is said that the father himself becomes the son in another form. The father and son are therefore considered to be non-different. A Widow who has her son is actually not a widow, because she has the representative of her husband'[১১] আসলে এখানে 'মা' ডিভার্সী নয়, বিধবা-এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে। আর একথাও অনস্বীকার্য যে রমা'র বিয়ের সিদ্ধান্ত-ই ব্যক্তিগত, তাই বিষয়টির সাধারণীকরণ যুক্তিযুক্ত নয়। বিধবা-র সন্তান থাকলে তার দ্বিতীয়বার বিয়ে করা নিয়ে যে অপরাধবোধের প্রশ্ন তোলা হয় তার যথার্থ উত্তর তো পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যেই রয়েছে - এর সাথে বংশানুক্রমিক পিতৃতন্ত্রের আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখার প্রশ্নও জড়িত। বহুকাল পূর্বে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মাতৃ-পরিচয়ই ছিল শিশুর পরিচয়, কিন্তু নারী পরাজিত হয়ে পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সুতরাং নারী যদি স্ব-সিদ্ধান্তে সন্তান সহ অপর পুরুষের কাছে যাওয়ার স্পর্ধা দেখায় তাহলে পুরুষের আর রইলো টা কি? যুগ যুগ ধরে তাই সন্তানের জননী, এই সত্য-ই তার চূড়ান্ত পরিচয়রূপে সমাজ মানসে বলিষ্ঠতা পেয়েছে, তাকে অস্বীকার করা কি খুব সহজ কাজ? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'প্রতিনিধি'র মত-ই আমরা অপর একটি উপন্যাস পাই। লেখিকা 'সাবিত্রী রায়'র 'স্বরলিপি' উপন্যাসের নায়িকা বিধবা সীতা'র পক্ষে তার প্রেমিককে স্বীকার করে নিতে সময় লাগে অনেক, কিন্তু তার কারণ তার সংস্কার নয়, সীতার কন্যার প্রতি স্নেহ, শাশুড়ির প্রতি কর্তব্যবোধ যেন নতুন সম্পর্কের মাঝে বাধা হয়ে ওঠে। লেখিকার মতে এ সমস্যা একান্ত মেয়েলি সমস্যা, কোন পুরুষ এ দ্বন্দ্বের সবটুকু রহস্য ধরতে পারবে না।'[১২] রমা'র আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রটি শেষ হয়। আসলে রমার মৃত্যু যেন চলে আসা সংস্কার-ঐতিহ্যকে সমর্থন করে, যেন পাপের (?) প্রশ্ন ওঠে। এই পাপবোধ-ও তো সামাজিক নির্মাণ যা নারী-পুরুষ ভেদে ভিন্নরূপ পায়। আর রমা/রমা-রা ক্রমশ জীবন থেকে ছিন্নমূল হতে হতে মৃত্যুতেই স্থিতি খুঁজে পায়। বর্তমান গবেষকের প্রশ্ন হল যে লেখক এবং পরিচালক উভয়েই কেন সন্তান সহ বিধবা বিবাহের পরিণতি সম্পর্কে সমকালীন সমাজের পছন্দমত একটা গ্রহণযোগ্য পরিণতি স্বীকার করে নিয়েছিলেন? রমা যদি ধীরে ধীরে সমস্যার মোকাবিলা করে একটা স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারতো তাহলে শুধু প্রথমে সন্তানসহ দ্বিতীয় বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ নয়, রমা চলে আসা পরম্পরার বিশ্বাস-কে প্রতিহত করার শক্তিতে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শেষপর্যন্ত একজন অপরাজিত স্বতন্ত্র নারী হতে পারতো, কিন্তু মূল কাহিনী বা চলচ্চিত্রে তা ঘটেনি, লেখক বা পরিচালক সেই বলিষ্ঠতা দেখান নি তাই রমা যেন তার ভুল সিদ্ধান্তের (স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত?) পরিণতিস্বরূপ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র নারী হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত বর্তমান গবেষক মনে ভারতের স্বাধীনতা (১৯৪৭)-র পর যখন একটি দেশ ও জাতি গঠনের নতুন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তখনও সামাজিক অবস্থান প্রশ্নে নারীর ভাবমূর্তি নির্মাণে প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিধান-ই ছিল প্রধান মাপকাঠি, সেই ভাবনা অনুসারে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের সংস্কার আন্দোলনের তুলনায় শতাব্দীর শেষপর্বের ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের অতীত ঐতিহ্য নির্ভরতার বিষয়টি ছিল

প্রাধান্যপূর্ণ। সুতরাং সেই সময়ের সাহিত্যে সমসাময়িক সমাজভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছিল এবং চলচ্চিত্রকার-ও বিষয়টি নিয়ে কোন বিতর্কিত ভাবনার সঞ্চার করেননি। সুতরাং আলোচিত চরিত্র রমার জন্য এ ধরণের আরোপিত সিদ্ধান্ত যে লিঙ্গ বৈষম্য ভাবনার অনুসারী ও নারী-মুক্তি বিরোধী সেকথা স্পষ্ট হয়ে যায়। আরও মনে হয় যে সমকালীন সময়ের আলোচিত সাহিত্য ও চলচ্চিত্রটিতে বিধবা নারীর পুনরায় বিবাহের সিদ্ধান্ত আপাতভাবে সংশ্লিষ্ট নারীকে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করলেও তার পরিণতির বিষয়টি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর বৈষম্যমূলক অবস্থানকেই যেন সুবিধাজনক সামাজিক বাস্তবতারূপে চিহ্নিত করেছিল।

ষাটের দশকে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই নারী চরিত্র প্রধান চলচ্চিত্র 'প্রতিনিধি' নির্মিত হলেও ১৯৭০'র দশক থেকে চলচ্চিত্র শিল্প চর্চায় নারীবাদে বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নারীবাদ মূলত পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নানা বৈষম্যের বিশ্লেষণ করে, যে সমাজে পুরুষ এবং পুরুষের দাবী এবং অধিকারগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা হয়ে থাকে এবং সেই প্রশ্নে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে। চলচ্চিত্র চর্চায় নারীবাদী তত্ত্বের সূচনা ঘটে দ্বিতীয় নারীবাদী আন্দোলনের সূত্র ধরে। ১৯৬০'র দশকে এই দ্বিতীয় স্তরের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল নারীর জীবনের প্রতিটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া। 'The Second Sex' এর রচয়িতা অন্যতম সমাজবিজ্ঞানী Simone de Beauvoir বিশ্বাস করতেন যে লিঙ্গ নির্ধারণ আসলে এক সংস্কৃতিগত বিষয় যা কিনা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা এবং দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা অভ্যাসের উপর। তিনি আরও মনে করেন যে নারী-কে সজ্ঞায়িত ও পৃথকীকৃত করা হয়ে থাকে পুরুষের প্রেক্ষিতে, পুরুষ-কে কিন্তু সেভাবে দেখা হয় না, নারী পুরুষের মত প্রয়োজনীয় নয়, অনেকটাই যেন ঘটনার ফলশ্রুতি। পুরুষ-ই হল কর্তা/চূড়ান্ত, এবং নারী তার প্রয়োজনে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট।[১৩] নৃতত্ত্ববিদ Levi Strauss আদিম যুগের মানুষের মধ্যে যে বিনিময় ব্যবস্থা ছিল তাকে exogamy বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে মহিলাদের এই ব্যবস্থায় নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ হত না, বরং অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন ও বিশ্বস্ততার প্রতীকরূপ কন্যা-দান করা হত, আর এভাবেই মানুষের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এরূপ ব্যবস্থায় নারী একটি বস্তুরূপে ব্যবহৃত হয়। আমরা বর্তমান গবেষণা পত্রে দেখার চেষ্টা করবো যে যুগ যুগ ধরে প্রবহমান বিবাহ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট সমাজ ও সংস্কৃতিগত বিভিন্নতা থাকলেও নারী আজও প্রদানযোগ্য, এবং যেহেতু সে এই সম্পর্কে প্রদান যোগ্য তাই প্রথম থেকেই তার নিজস্ব পরিচয়ের ভিত্তিটি বিশেষ শক্তি পায় না, গ্রহীতার (স্বামী) পরিচয়ের ভিত্তিতেই তার পরিচিতি ঘটে। হিন্দু বাঙালি সমাজে বিবাহের সময় কন্যা-কে ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুসারে সম্প্রদান করার (পাশাপাশি আইন সম্মত বিবাহ বিধি থাকলেও) সাথে সাথে বিষয়টির উপর দাম্পত্য সম্পর্কের পবিত্রতার ধারণাটিও সংযুক্ত হয়, এবং এই ধারণার সঙ্গে যদিও পরস্পরের কর্তব্য পালনের বিষয়টিও সংযুক্ত তথাপি বাস্তবে সেই কর্তব্য পালনে নারী বা পুরুষ – ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যেকোন কারণেই যদি অপারগ হয় সেক্ষেত্রে পুরুষের জন্য প্রধান সহায়ক হয় পরম্পরাগত সামাজিক ভাবনা – যে ভাবনায় পুরুষের জন্য বিশেষ সুবিধার অনুমোদন থাকলেও নারীর জন্য রয়েছে সামাজিক বিচার ও বৈষম্যমূলক মূল্যায়ন, কারণ বিবাহ মাধ্যমে নারী-কে লাভ করা হয়েছে, সুতরাং তাদের পরস্পরের অবস্থান সমান নয়। অন্যদিকে গ্রহীতার বিরুদ্ধে তার অবস্থান যথার্থ কারণ সাপেক্ষে তাই আইনত সমর্থন যদিবা পায়, সামাজিক অনুশাসনের তির্যক চাহনি সেই নারীকে যথেষ্টহ অস্বস্তিতে রাখে। তবুও কোন কোন সময় নারী প্রচলিত ভাবনার বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়, হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র। এই সামাজিক বাস্তবতার প্রভাব বাংলা চলচ্চিত্রে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে অপর্ণা সেন পরিচালিত বাংলা চলচ্চিত্র 'পারমিতার একদিন' (House of Memories') কে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। চলচ্চিত্রের প্রধান নারী চরিত্র পারমিতা কিভাবে অন্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র হয়ে উঠলো তা বিশ্লেষণ করা এই পর্যায়ের উদ্দেশ্য। এই চলচ্চিত্রে পরিচালক পারমিতার দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি তার সঙ্গে সংসারে অপর দুইজন নারী চরিত্রের মধ্যে কিভাবে সম্পর্কের বুনন তৈরী হচ্ছে, সেই বিষয়টি চলচ্চিত্রের ভাষায় তুলে ধরেছেন এবং এজন্য তিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমগুলি (Spoken diologue, body language, facial expression as well as the silences) উপযুক্তভাবে ব্যবহার করেছেন, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[১৪]

অপর্ণা সেনের পারমিতার একদিন (১৯৯৯) চলচ্চিত্রটিতে পারমিতার চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, চলচ্চিত্র অনুসারে ঋতুপর্ণাকে আপাতভাবে সাধারণ মনে হলেও তার নিজের এবং অন্যান্য সম্পর্কগুলি সম্পর্কে অন্তর্দর্শন করার ক্ষমতা রয়েছে।

পারমিতার সংঘাতের প্রধান জায়গা হল সংস্কৃতিগত, যেখানে একদিকে দক্ষিণ কলকাতার মুক্ত ভাবনাচিন্তা আর অন্যদিকে উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যশালী – ছকে বাঁধা ধ্যান ধারণার মধ্যে সংঘাত ছিল অনিবার্য। এবং এই সংঘর্ষের প্রধান দুজন ছিলেন পারমিতার স্বামী-বীরেশ্বর (অভিনয়ে রজতাভ দত্ত) এবং বীরেশ্বরের বাবা, আর এই অবস্থায় পারমিতার পক্ষে একমাত্র শাশুড়ী সনকার (অভিনয়ে অপর্ণা সেন) সাথেই সমস্ত আবেগ-অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া সম্ভব হত। পারমিতার সম্বন্ধ করেই বিয়ে হয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য মেয়ের মত পারমিতাও বিবাহিত জীবন ও শ্বশুর বাড়ী সম্পর্কে স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু জীবনের সবকিছু মানুষের ইচ্ছেমত ঘটে না, সাধারণ চাওয়া-পাওয়ার সাথে বাস্তবের পরিস্থিতিগত সংঘাত এবং তার বিপরীতে এক সময় জীবনকে অন্যভাবে দেখার চেষ্টার মধ্য দিয়েই একসময় পারমিতা পরিণত হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে সমকালীন অনেকের তুলনায় পৃথক, স্বতন্ত্র।

চলচ্চিত্রটি শুরু হয় একটি তাৎপর্যপূর্ণ দৃশ্যের মধ্যে, যেখানে আমরা দেখতে পাই যে পারমিতা সনকার (অভিনয়ে অপর্ণা সেন) শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত। এখানে ক্যামেরা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই পারমিতার নীরব পর্যবেক্ষণ এবং অন্তর্দর্শনকে তুলে ধরে। পারমিতার পরিবর্তিত পোষাকের ভাষা, মোবাইল ফোনে সর্বদা ব্যস্ততা বুঝিয়ে দেয় যে পারমিতা পূর্বাবস্থা থেকে উত্তরিত। চলচ্চিত্রের সবটাই মূলত পারমিতা'র স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে হয়। চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু একদিনের ঘটনা নয়, বরং একদিনে ১৪ বছরের স্মৃতিকে ফিরে দেখার চেষ্টা, যা সনকার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শুরু ও শেষ হয়েছে। পারমিতা মনে করার চেষ্টা করে

যে কিভাবে নানা পরিস্থিতিতে সে সান্যাল বাড়ী ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল এবং অসুস্থ শিশু বাবলুর মৃত্যুর পর স্বামী বীরেশ্বরকে ডিভোর্স দিয়ে চলচ্চিত্র পরিচালক রাজীব শ্রীবাস্তবকে বিবাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পারমিতা অতীতের দিকে ফিরে তাকায় – প্রথম থেকেই বীরেশ্বর এবং তার মধ্যে সংস্কৃতিগত বিস্তর পার্থক্য ছিল। পারমিতা প্রত্যেক দিনের কথা ভাবে, -- কিভাবে বীরেশ্বর তাকে রাত্রে আহ্বান করতো? বীরেশ্বরের অপরিশীলিত দেহভঙ্গী, বাবলুর জন্মের জন্য পারমিতা এবং তার পরিবারকে দায়ী করা ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যেই পারমিতা খুঁজে পায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসহায় অবস্থানকে।

পারমিতার ননদ খুকু (অভিনয়ে সোহিনী সেনগুপ্ত) কিছুটা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। প্রথম থেকেই পারমিতা খুকুর প্রতি স্নেহশীল হলেও, বাবলুর জন্মের পর সনকার সাথে পারমিতার সম্পর্কের গভীরতা অনেক বৃদ্ধি পায়, কারণ দুজনেই একই যন্ত্রণার শরিক। পারমিতা পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, বা এজন্য কাউকে দোষারোপও করেনি বরং শান্তভাবে নিজের কর্তব্য পালন করে গেছে। পারমিতা-সনকার বন্ধুত্বের মধ্যে আমরা সনকাকে তার শৈশব-কৈশোরে ফিরে যেতে দেখি, সনকা পারমিতাকে তার অল্প বয়সের মুখস্থ করা কবিতা শোনায়, পারমিতাও নিজের লেখা কবিতা 'আত্মজ' সনকাকে শোনায়। পারমিতা সনকার গালে পাউডার লাগিয়ে দেয়, তারা পরস্পরের সাহায্যে স্নান করে আবার একই সাথে বাজার করতেও যায় আর তারপর তারা দুজনে রেস্তোঁরায় যায় এবং সেখানে সনকা-হিন্দু মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল বাড়ীর বিধবা হয়েও, পারমিতার সঙ্গে বসে বসে মাছের কাটলেটও খান। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় বৈধব্য পালনের প্রশ্নে মাছ খাওয়া প্রসঙ্গে – সুলেখা দাশগুপ্ত'র লেখা উপন্যাস – 'মিত্রা' (১৯৬৭), সেখানে লেখিকা এই সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বলেন, 'কখনও না খেলে স্বামীর অকল্যাণ কখনও খেলে তোমার পাপ যেন খেলা-জীবনটা খেলা আর কি।'[১৫] পারমিতা এবং সনকার সম্পর্কের নানাদিক রয়েছে। পারমিতা কেবলমাত্র সনকার পুত্রবধূই নয়, একই সাথে মাতৃত্বের দায়েও সে আবদ্ধ। সনকা যেমন খুকুর জন্য, পারমিতাও তেমন বাবলুর জন্য সর্বদাই চিন্তিত, এখানে নারীত্ব এবং মাতৃত্ব হাত ধরে চলেছে। জীবনে চলার পথে সনকা এবং পারমিতা অজান্তেই পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে, চাপিয়ে দেওয়া সামজিক সম্পর্কের বাইরেও উভয়ের মধ্যে একপ্রকার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। যখন বীরেশ্বর অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বাবলুর অপ্রকৃতিস্থভাবে জন্মের জন্য পারমিতাকে দায়ী করেছে তখন একমাত্র শাশুড়িমা সনকা-ই প্রতিবাদ করেছেন শুধু তাই নয়, একথাও বলেছেন যে খুকুর জন্য পারমিতাও দোষারোপ করতে পারে কিন্তু তা সে করেনি। চলচ্চিত্র যেভাবে পারমিতা, বীরেশ্বর এবং সনকার মধ্যকার কথোপকথন এবং সনকার যুক্তি –তর্ককে তুলে ধরেছে তা নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না। পারমিতা এবং সনকার সম্পর্ক শুরুই হয়েছিল কিছু সমস্যার মধ্য দিয়ে, এবং এই সমস্যাগুলিই অজান্তে দুজনকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। কিন্তু বাবলুর মৃত্যুর পর সমস্যার গতিমুখ পরিবর্তিত হয়, সনকার পারমিতার প্রতি নির্ভরতার প্রশ্নে সন্দেহ দেখা দেয়। ইতিমধ্যে পারমিতার সাথে রাজীব শ্রীবাস্তব নামে একজন চিত্র-পরিচালকের দেখা হয় (অভিনয়ে রাজেশ শর্মা), যখন পারমিতা নিয়মিতভাবে বাবলুর চিকিৎসার জন্য spastic school এ যেত। এখন বাবলুর মৃত্যুর পর পারমিতা তার সিদ্ধান্ত জানায় যে সে বিবাহ বিচ্ছেদ চায় এবং নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চায়। সনকার কাছে পারমিতার এই সিদ্ধান্ত বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত মনে হয় কারণ সনকার জীবনে পারমিতা-ই একমাত্র মানুষ যার সাথে সনকা প্রতিদিনের সমস্যা ভাগ করে নিতে পারে। ফলে এই সংবাদে স্বাভাবিকভাবেই সনকার মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়, সনকা পারমিতাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে একজন পুরুষ কোনদিন-ই একজন নারীকে বুঝতে পারে না এবং এভাবেই সমস্ত পরিবারগুলি চলছে, সনকা আরো জানায় যে মানুষের স্বপ্নের মত কোন সংসার-ই হয় না। পারমিতাকে বোঝানোর জন্য সনকা নিজের ব্যর্থ ভালোবাসার কথাও জানায় যে সনকা মণিময় (অভিনয়ে সৌমিত্র চ্যাটার্জী) এর জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পারলেও, মণিময় সনকাকে ভালবেসে বিয়ে করার নৈতিক সাহসটুকু পর্যন্ত দেখাতে পারেনি এবং এই নৈতিক সাহসের অভাব হল একধরনের স্বার্থপরতা। সুতরাং পারমিতা রাজীবের সঙ্গে একটা সম্পর্ক রাখতে পারে কিন্তু সেই সম্পর্ককে বিবাহ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত একেবারেই অযৌক্তিক ও বোকামি হবে, যা সময়ের সাথে সাথে পারমিতা বুঝতে পারবে। পারমিতা সনকাকে ভালবাসে, কিন্তু সনকার ভবিষ্যত নির্দেশের উপর নির্ভর করে পারমিতা তার ভবিষ্যতে নতুন জীবনলাভের সম্ভাবনাকে নষ্ট করতে চায়নি। পারমিতার ১৪ বছরের বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে পরিণত ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল এবং এই আত্মবিশ্বাস তাকে নিজের পছন্দমত নতুন এক বিবাহিত জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হয়েছিল। এই পারমিতা এখন নিজেই বক্তব্য রাখতে পারে, তার সম্পর্কে অন্যের বক্তব্য এখন গ্রাহ্য নয়। এখানে সমাজতাত্ত্বিক Anthony Giddens'র বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে তিনি বলেন, '… that intimate relationships have become 'democratized', so that the bond between partners – even within a marriage has little to do with external laws, regulations or social expectations, but is based on the internal understanding between two people -- a trusting bond based on emotional communication. Where such a bond ceases to exists, modern society is generally happy for the relationship to be dissolved. Thus we have 'a democracy of the emotions in everyday life।'[১৬] সুতরাং প্রথমবারের বিবাহে পারমিতার কোন মতামত দেওয়ার সুযোগ না থাকলেও দ্বিতীয়বার পারমিতা নিজের ইচ্ছেমত বাঁচার সাহস দেখিয়েছিল, প্রয়োগ করেছিল তার নাগরিক অধিকার এবং হয়ে উঠেছিল স্বতন্ত্র নারী, সেকথা বলাই যায়। পারমিতা বাড়ী ত্যাগ করলে আমরা সনকাকে আর একবার পরাজিত হতে দেখি। ইতিমধ্যে সময় অতিক্রান্ত হয়, সনকা অসুস্থ হয়ে পড়ে, সনকা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু পারমিতা তার আবেগকে সনকার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করেনি। পারমিতা তার সঙ্গে সনকার বন্ধনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছে পূর্বের আরোপিত সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের বাইরে গিয়েও, পারমিতা নিয়মিতভাবে সনকার সেবা করেছে, পরিস্থিতি অনুসারে, এবং এজন্য সে কোনরকম সামাজিক

সমালোচনাকে গুরুত্ব দেয়নি। এখানে পারমিতা 'essential' হয়ে উঠেছে নারী সম্পর্কে প্রচলিত সব 'inessential' ধারণাকে অস্বীকার করেই।[১৭] পারমিতা হয়ে উঠেছে মানবিক ও স্বতন্ত্র নারী।

পারমিতা যে ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিবোধ নিয়ে সান্যাল বাড়িতে প্রবেশ করেছিল বাস্তনে তা শূন্যতায় পরিণতি পায়। অন্যান্য আর পাঁচটা মেয়ে যেমন শিশু বয়স থেকেই সুগৃহিনী হওয়ার স্বপ্ন দেখে, পারমিতাও তাই দেখেছিল। কারণ ছোটবেলা থেকেই আমাদের আদর্শ মা এবং স্ত্রী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। Beauvoir মনে করেন যে নারী-পুরুষ হল সামাজিক নির্মাণ, এবং সে কারণেই কেন মেয়েরা পুতুল খেলে বা বালকেরা ব্যাট-বল খেলে তা স্পষ্ট, একই কারণে তাই বাবা-মা বলেন কারো পুত্র সন্তান হলে বিশেষ চিন্তা না হলেও কন্যা সন্তান হলে চিন্তা আছে কারণ বিয়ে দিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে লেখিকা মৃণাল পাণ্ডে 'Girls' নামক একটি ছোট গল্পে ৮০-র দশকে দেখিয়েছেন যে শিশুকাল থেকেই ভারতীয় পরিবারে কন্যা সন্তানরা কতটা বৈষম্যের মধ্য দিয়ে বড় হয় এবং এই বোধ তাদের আজীবন বুঝিয়ে দেয় যে পুত্র সন্তানদের সাথে তাদের সমান অবস্থান সমাজ পরম্পরায় গ্রাহ্য নয়। পারমিতা তার এবং বীরেশ্বরের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তা অবশ্যই অনুধাবন করেছিল, এবং প্রথম থেকেই বীরেশ্বরের সাথে পারমিতার দাম্পত্য সম্পর্ক দুর্বল হলেও বাবুলকে কেন্দ্র করে সান্যাল বাড়ীতে পারমিতা নিজেকে মানিয়ে নেওয়াটাই যথার্থ বলে মনে করেছিল। এবং এ বিষয়ে সনকাকে দেখে সে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, কারণ আমাদের পরম্পরা মা-কে সন্তানের জন্য সব কিছু মানিয়ে নিতে শেখায়। যদিও দাম্পত্য সম্পর্কের শক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল, পারমিতা কিন্তু সংসারের অন্যান্য সম্পর্ককে তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করেনি, এবং অন্যান্য সম্পর্কের প্রতি নীতি ও কর্তব্যের প্রশ্নে সে যথার্থ থাকার চেষ্টা করেছে, বিশেষত খুকু, সনকা এবং মণীমামার ক্ষেত্রে। পারমিতা শান্তভাবে তার কর্তব্য পালন করেছে, পারমিতা তার বিপরীত চরিত্রের মানুষ বীরেশ্বর এর সাথে প্রতিনিয়ত বিবাদে যায়নি, কিন্তু যেখানে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা দরকার, সেখানে সে প্রতিবাদ করেছে (যখন বীরেশ্বর পারমিতাকে বা তার পরিবারকে সম্ভাব্য কোন গোপন ব্যাধির কারণে বাবলুর জন্মের জন্য দায়ী করেছিল), অপর্ণা সেন অসাধারণভাবে এই প্রতিবাদের দৃশ্যটি তুলে ধরেছেন।

পারমিতা শেষপর্যন্ত সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল, সম্পর্কটা ভেঙে ফেলতে সে ভয় পায়নি, কারণ বাবলুর মৃত্যুর পর এই সম্পর্কটা তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে, এমনকি যদি রাজীবের সঙ্গে দেখা নাও হত তাহলেও। রাজীবের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সম্পর্ক ভাঙার বিষয়টা দ্রুত হয়ে ওঠে। পারমিতা সেইসব নারীদের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে যারা, নারীকে সম্মান করে এবং নিজেদের পুরুষের রাজত্বের পুতুল মনে করে না, আর তাই তারা স্বতন্ত্র। পারমিতা দৃঢ়ভাবে এই সিদ্ধান্ত নেয়, অন্যকারও উপদেশের উপর সে নির্ভর করে না। শুধু তাই নয় দ্বিতীয় বিবাহের সিদ্ধান্তও সে একাই নিয়েছিল।

কেন পারমিতা এই সিদ্ধান্ত নিল? পারমিতা কি নিজেকে আবিস্কার করেছিল? নিজেকে আবিস্কারের জন্য নিজস্বতা প্রয়োজন, পারমিতার সেই নিজস্বতা বিবাহের পূর্বে ও পরে অন্য লোকজনদের দ্বারা নির্দেশিত/নির্ধারিত হত, এবং নিজের অজান্তেই অন্যদের ইচ্ছাপূরণ করতে করতে পারমিতা তার নিজস্ব সত্তাকে ভুলতে বসেছিল। কিন্তু একসময় পারমিতার অন্তর্দর্শন তাকে নিজের মুখোমুখি করলো। পরিচালক এই চলচ্চিত্রে পারমিতার মধ্য দিয়ে এক স্বতন্ত্র নারীর আত্মানুসন্ধানের যাত্রাটি তুলে ধরেছেন। পারমিতা শুধু একটি অর্থহীন সম্পর্ককে বয়ে নিয়ে চলার অসৎ প্রয়াস থেকেই যে শুধু নিজেকে মুক্তি দিয়েছিল তাই নয়, সে নিজেকে কেবলমাত্র গৃহবধূর স্তরে আর সীমায়িত রাখতে চায়নি এবং সেজন্যই গৃহকর্মের বাইরে বৃহত্তর কর্মজীবনের সাথেও সে নিজেকে সংযুক্ত করেছিল, নারীমুক্তির পথে যা বিশেষভাবে গ্রাহ্য হয়ে থাকে। এই আত্মানুসন্ধান পর্বটিতে স্রোতের বিপরীতে হাঁটার জন্য পারমিতাকে বারংবার নানা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হলেও বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষমূহুর্তে অপর্ণা সেন পারমিতার উন্মেষের মধ্য দিয়ে একপ্রকার নতুন নারীর আগমনী বার্তা শোনাতে চেয়েছেন, এই পারমিতা'দের অবস্থান ষাটের দশকের রমা'দের তুলনায় অনেকটাই অগ্রগতির পরিচায়ক, যদিও পারমিতা (অন্তত চলচিত্র অনুসারে) অসুস্থ বাবলুর মৃত্যুর পরেই নিজের কথা ভাবতে পেরেছিল, আর রমা পুত্রের কারণেই (তার নিজের বিশ্বাস অনুসারে) নিজের জীবনের প্রতিও মায়া ত্যাগ করেছিল। আসল কথা হল সময়ের সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্তন মানুষের চেতনাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে মা-এর দ্বিতীয় বিবাহের বিষয়টি যেভাবে সমালোচিত হতে পারতো, আজকের দিনে সেই একই বিষয়ে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী বেশ কিছুটা সংস্কারমুক্ত, ফলে আজকের রমাদের সাধারণত পাপ-পুণ্যের দোলাচলে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত না নেওয়াই স্বাভাবিক এবং পাশাপাশি পারমিতা'রাও আজ সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে – জানিয়ে দিচ্ছে যে তারা নিজেরাই এক সময় একক স্বতন্ত্র নারী থেকে স্বতন্ত্র গোষ্ঠীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১। Deshpande Anirudh, Images and Power in Modern Visual Marratives, Class, Power And Consciousness In Indian Cinema And Television, Primus Books, 2009, p-3

২। দাশগুপ্ত ধীমান, পরিভাষা কোষ, সুজন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ ১৭৪, ১৭৭ যেকোন মাধ্যমের শিল্পকর্মকে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিশেষভাবে যে শিল্প প্রজাতির শ্রেণীভুক্ত করা হয় তাকে শিল্প প্রজাতি বা জ্যঁর (Genre) বলা হয়।

চলচ্চিত্র শিল্প যখন প্রধানত গল্প, উপন্যাস, সাহিত্য অথবা কথোপকথনের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে তখন তার মধ্যে নাটকীয় বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পায় এবং সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রটি Drama Genre-র শ্রেণীভুক্ত হয়।

৩। Annette Kuhn & Guy Westwell,*Feminist Film Theory, Woman's Picture,* Dictionary Of Film Studies, Oxford University Press, 2012(pp-157-158 &453-454)

৪। Louis Dumont, ' *Genesis-I', Essays on Individualism: Modern Ideology in Anthropological Perspective,* University of Chicago Presss Ltd, London, 1983, Paperback-1992, p-25 .

৫। John W. Hood, '*The magnification of the Mundane', chasing the Truth, The Films of Mrinal Sen,* Seagull, Calcutta, 1993, p. 49.

৬। Chaudhuri Sohini, '*Psychoanalysis and Femiism', Feminist Film Theorists, Laura Mulvey,Kaja Silverman, Teresa de Lauretis, Barbara Creed,* Routledge, First Indian reprint-2009, p. 18

৭। Mukhopadhyay Dipankar, *Mrinal Sen-Sixty Years in Search of Cinema,* Harper Collins Publishers India, a joint venture with The India Today Group, New Delhi, 2009, p. 41

৮। Ibid

৯। Ibid

১০। John W. Hood, *Chasing the Truth – The Films of Mrinal Sen.* Seagull, Calcutta, 1993, p. 49

১১। ভগবত গীতা, 3:23:52 www.16108.com/drama/training/divorce.htm

১২। বসু রাজশ্রী, বাসবী চক্রবর্তী (সম্পাদনা), প্রসঙ্গ-মানবী বিদ্যা, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ২৫৮।

১৩। সিমন দ্য বোভোয়ার, স্ত্রী লিঙ্গ (The Second Sex), ভাষান্তর লতিকা গুহ, দীপায়ন, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ 'প্রাককথন'।

১৪। Jasbir Jain & Sudha Rai (ed), *Filmsand Feministm – Essays in Indian Cinema,* Rawat Publications, Jaipur, 2009, p. 9

১৫। বসু রাজশ্রী, বাসবী চক্রবর্তী (সম্পাদনা), প্রসঙ্গ-মানবী বিদ্যা, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ২৫৮।

১৬। David Gauntlett – *Media, Gender and Identity – An introduction,* Rutledge-London and New York-2002, p. 3

*****